স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া

প্রকাশক

স্বামী অভয়ানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া

৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্যঃ এক টাকা

মুদ্রক: আভা প্রেস
৬বি,গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৫

স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ (১৮৯৯-১৯৮৮)

স্বামী গম্ভীরানন্দ

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস। এক সৌম্য যুবক হঠাৎ একদিন কাশীতে উপস্থিত। কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে থাকেন যুবকের শিক্ষক। তবে তিনি সন্ন্যাসী। যুবক শুনেছেন তাঁর শিক্ষক আছেন ওখানে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, তিনি নেই–গেছেন অন্যত্র। যুবকের উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করা। মনের মহৎ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষের কাছে। অধ্যক্ষ কিন্তু রাজী হলেন না। কারণ, সে সময় চারদিকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও হামলা চলছিল। সরকারের এদিকে দৃষ্টি ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের উপর। সেজন্য অপরিচিত কাউকে রাখার নিয়ম ছিল না। অধ্যক্ষ বললেন: 'আমরা কোন অপরিচিত ছেলেকে রাখি না। শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমার বেশী। সেবাশ্রমে তোমার সুবিধা হবে না। বরং তুমি বেলুড় মঠে যাও।' যুবকের সপ্রতিভ উত্তর: 'মহারাজ, অপরিচিত বলে আপনি আমাকে যোগদান করতে দিচ্ছেন না। যদি আমি বেলুড় মঠে যাই, সেখানেও তো হবে একই সমস্যা। আপনি কি আমাকে দয়া করে একটি পরিচয় পত্র দেবেন? অধ্যক্ষের অসহায় স্বর: 'আমি তোমাকে চিনিই না। কেমন করে দেব পরিচয় পত্র।' যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত আবেদন: 'যদি আপনি লিখে দেন যে আমি স্বামী জগদানন্দজীর সন্ধানে কাশীতে এসেছিলাম। আপনি নিশ্চয় এটি লিখে দিতে পারবেন।' রাজী হলেন অধ্যক্ষ। এই প্রত্যাখ্যাত প্রত্যুৎপন্নমতি সৌম্য যুবকটি হলেন পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম যতীন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ২৯শে মাঘ ১৩০৫ সাল)। শিলেট জেলার (বাংলাদেশ) সাধুহাটি গ্রামে। তাঁর পিতা-মাতার নাম দীননাথ ও তারাসুন্দরী দেবী। তাঁরা ছিলেন স্থানীয় জমিদার–শাক্ত পরিবার। মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা। তিনি প্রতিদিন সুদীর্ঘকাল জপে মগ্না থাকতেন। মাঝে-মধ্যে তারাসুন্দরী নিজেই শিবমূর্তি তৈরী করে পূজার পর বিসর্জন দিতেন পুকুরে। যতীন্দ্র ছিলেন পিতা-মাতার শেষ সন্তান। তাঁর ছিল দু' দাদা ও এক দিদি–জীতেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও সুষমা। এখন আর জীবিত কেউ নেই। যতীন্দ্র ছিলেন বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মানুষ। তাঁর বাল্যকালেই বাবার মৃত্যু হয়। বর্ধিষ্ণু মামার বাড়িতে লালিত-পালিত হন যতীন্দ্র। বড় মামা অভয়কুমার দাম ছিলেন তাঁর অভিভাবক। কারণ, যতীন্দ্রের কাকা-জেঠামশাই কেউ ছিল না। মামাদের বাড়িতে যেমন প্রতিষ্ঠিত নিত্যপূজিত শ্রীমদনমোহনজী ছিলেন, তেমনি ধূমধাম সহকারে হত শ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীকালীপূজা। এরকম পরিবেশে ছোটবেলা কেটেছে যতীন্দ্রের। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন খুব শান্তশিষ্ট, ধীরস্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির।

সাধুহাটিতে যতীন্দ্রের পড়াশুনা আরম্ভ হয়। ওখানকার মৌলভীবাজার হাইস্কুলে ভর্তি হন তিনি। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিছুকাল শিলং সরকারী হাইস্কুলে পড়াশুনা

করে আবার চলে আসেন মৌলভীবাজার হাইস্কুলে। ওখান হতে কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে। এ পরীক্ষায় তিনি পেয়েছিলেন স্কলারশিপ। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যতীন্দ্র আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে। থাকতেন কলেজেরই পাশে অগিলভি হোস্টেলে। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক সজনীকান্ত দাস ও সাহিত্যিক গোপাল হালদার। ছাত্রাবস্থায় যতীন্দ্র ছিলেন খেলাধূলায় পারংগম–ফুটবল, ভলিবল, রোয়িং প্রভৃতিতে। পরবর্তী জীবনেও তিনি রেডিওতে শুনতেন খেলার ধারা বিবরণী। একেবারে শেষের দিকে খোঁজ রাখতেন খেলার খবরের। বাড়ি থেকে বড়দা টাকা পাঠাতেন। ঐ টাকা ও স্কলারশিপের টাকা দিয়ে তিনি নির্বাহ করতেন পড়ার খরচ। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে অর্থনীতিতে অর্নাস সহ বি. এ. পাশ করেন। বি. এ.-তে তাঁর বিষয় ছিল–ইংরাজী, বাংলা, গণিত ও অর্থনীতি।

স্নাতক উপাধি লাভের পর যতীন্দ্র চাকরি করেন বার্মার রেংগুনে সামরিক বিভাগে একাউন্ট-অফিসাররূপে। সেখানে সৈনিকদের জীবন-চর্যা তাঁকে জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। বাড়িতে পড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুস্তক। তার আগেই কিছুকাল শিলেটে মামাবাড়িতে থাকাকালীন যতীন্দ্রের সম্ভবতঃ পরিচয় হয়েছিল শিলেট রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সংগে। তিনি প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামীজীর বই পড়ে। ওতেই তাঁর বৈরাগ্যের উদয় হয়। রেংগুনে নিজের বাসার ছাদে বসে তাকিয়ে থাকতেন নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে। দেখতেন এক অজানা দেশের হাতছানি। চারিদিক নির্জন। আবার পরক্ষণেই চোখ পড়ত সামরিক ছাউনীগুলির দিকে। লক্ষ্য করেছিলেন সৈনিকদের অনৈতিক জীবন, অগভীর জীবন, অমানুষিক জীবন। সেই সংগে দেখেছিলেন তাঁদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলাপরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলত সৈনিকদের জীবন ও স্বামীজীর আহ্বান। আদর্শবাদী ছিলেন তিনি। আদর্শহীনের বিরুদ্ধে আপোষ করতেন না কখনও। জয় হল স্বামীজীর আদর্শের। সংকল্প গ্রহণ করলেন সংসার ত্যাগের। চিরদিনের জন্য গ্রহণ করলেন সৈনিকদের কঠোরতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাপরায়ণতা। কারণ, তিনি হবেন স্বামীজীর সৈনিক, ভবিষ্যতে হবেন তাঁর সেনাপতি।

রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদানের ইচ্ছায় কাশী হয়ে বেলুড় মঠে এলেন যতীন্দ্র। অথচ কলকাতার কলেজে পড়ার সময় একবারও তাঁর মনে হয়নি উদ্বোধনে শ্রীমাকে বা স্বামী সারদানন্দজীকে দর্শন করার। কিংবা বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সান্নিধ্য লাভ করা। যতীন্দ্র যখন বেলুড় মঠে আসেন, তখন সংঘাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী–মহাপুরুষ মহারাজ। কাশীর পুনরাবৃত্তি ঘটল এখানেও। মঠের কেউ চেনেন না যতীন্দ্রকে। স্বামীজী-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজী (তদানীন্তন মঠ-মিশনের যুগ্ম সম্পাদক) তাঁকে শোনালেন নিরাশার কথা। মুষড়ে পড়লেন যতীন্দ্র। মনের আশার আলো বুঝি নিবু নিবু। কিন্তু তিনি শ্রীভগবানের চিহ্নিত ব্যক্তি। সব বাধার অবসান হল। ঠিক ঐ সময়ে

উপস্থিত ছিলেন দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দ ও চিফ সুপারভাইজার স্বামী নির্বেদানন্দ। তাঁরা যতীন্দ্রকে প্রস্তাব দিলেন দেওঘর যাবার। রাজী হলেন তিনি। স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁকে রাখলেন কলকাতার একটি মেসে। তিনি মনে করেছিলেন যে ছেলেটি চায় একটি চাকরি। কিন্তু যতীন্দ্রের সুস্পষ্ট অভীপ্সা–সাধু হবেন তিনি। তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগ দেওয়া ঠিক হল। দেওঘরে যাওয়ার আগে যতীন্দ্র মঠে গেলেন মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি বেলুড়ে থাক। আগে তোমার চরিত্র গঠিত হোক। তারপরে কাজ করবে।" যতীন্দ্র বুঝলেন মহাপুরুষ মহারাজের কথা। সাধু জীবনে প্রথম প্রয়োজন চরিত্র গঠন করা। এইটি ভেবে নিয়ে যতীন্দ্র দেওঘরে যোগদান করলেন ব্রহ্মচারী হিসাবে। সময় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের মে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। সে সময় নির্বেদানন্দ যতীন্দ্রকে বলেছিলেন: "সময়ে তোমাকে সংঘের অনেক কাজ করতে হবে।" পরবর্তীকালের ইতিহাসে তাই দেখতে পাওয়া যায়। যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠে ছিলেন প্রায় এগারো বছর। দু বারে ১৯২৩–২৯ ও ১৯৩১–৩৫ তে। প্রথমে কর্মী, পরে প্রধান শিক্ষক ও শেষে অধ্যক্ষরূপে।

দেওঘরে থাকতে থাকতে যতীন্দ্র ব্রহ্মচর্য, মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস সবই লাভ করেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে। প্রথম হতেই মহাপুরুষ মহারাজকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন তিনি। তাঁকে কেউ কেউ শ্রীঠাকুরের অন্য কোনো পার্ষদের কাছ হতে দীক্ষা নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজী হননি তিনি। আগেই তিনি মনে মনে মহাপুরুষ মহারাজকে নিজ হৃদয়ে বসিয়েছিলেন গুরুপদে। মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে প্রথম দর্শনের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি, "প্রথম যখন বেলুড়ে আসি তখন মঠের কর্মপরিচালকদের কাছে শুনেছিলাম মহাপুরুষজী খুবই কড়া মেজাজের লোক আর খুব গম্ভীর, বেশী কথাবার্তা না বলে এ কথায় সব সেরে দেন। তাই তাঁদের কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজজীর সম্বন্ধে মনে বেশ একটা ভয় ছিল, কিন্তু প্রথম যেদিন দেখা হল সেদিন আমি চুপ করেই বসেছিলাম, অপর দু' একজন যাতায়াত করছিলেন বা দু' একটি কথাও বলেছিলেন, আমি তাঁর দিকে সর্বদা তাকিয়ে বসেছিলাম এবং তিনিও মাঝে মাঝে আমাকে দেখছিলেন। অতি সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা এবং গায়ের রং ছিল খুব ফরসা, দৃষ্টিতেও ছিল একটা স্নেহের ভাব। সুতরাং ভয় সম্পূর্ণ না কাটলেও মনে মনে স্থির করেছিলাম এই সৌম্য শান্ত সাধু মহারাজই হবেন আমার জীবনের পথ প্রদর্শক।"

বিদ্যাপীঠে থাকতে এক সাহসের কাজ করলেন যতীন্দ্র। তাঁর মনে তীব্র ইচ্ছা মহাপুরুষ মহারাজের কাছ হতে মন্ত্রদীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য নেওয়া। সবে মাত্র সাত-আট মাস এসেছেন তিনি। অধ্যক্ষকে না জানিয়ে সোজা চিঠি লিখে মনের কথা জানালেন মহাপুরুষ মহারাজকে। অনুকূল উত্তর এল। এ কথা জানতে পেরে অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দ একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু সংঘাধ্যক্ষের আদেশে যতীন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন বেলুড় মঠে।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি। ঐ পুণ্য দিনে সকাল ৯-৩০

মিনিটে যতীন্দ্রের ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান হল আরোও কয়েকজনের সংগে। আচার্যের আসনে ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দজী। যতীন্দ্রের নতুন নাম হল সৌম্যচৈতন্য। তাই মহাপুরুষ মহারাজ দেখা হলেই ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা স্মরণ করে বলতেন 'সদেব সৌম্য'। তিনদিন স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করলেন মঠের পদ্মপুকুরের পাড়ে (বর্তমানে নেই)। তখনও কিন্তু যতীন্দ্রের হয়নি মন্ত্রদীক্ষা। তিনদিন হবিষ্যান্নের পর চতুর্থ দিনে মহাপুরুষ মহারাজ নিজে থেকেই তাঁকে ও মতি মহারাজকে (শিবস্বরূপানন্দ) বললেন : 'আজকে খাবি না। আজকে তোদের দীক্ষা হবে।' ঐ দিনটি ছিল মহাপুরুষ মহারাজের শুভ জন্মতিথি। এরপর তাঁর নিজের কথায়–"দীক্ষা হয়েছিল পুরাতন ঠাকুর ঘরে; মহাপুরুষজী বসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে উত্তরমুখ হয়ে এবং আমি বসেছিলাম মহাপুরুষজীর সামনে দক্ষিণমুখ হয়ে। তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে বীজমন্ত্রটি গংগাজল দিয়ে মেঝেতে লিখে বুঝিয়ে দিলেন, তারপর বললেন 'গুরুদক্ষিণা দাও'। আমি এসব নিয়ম-বিধি কিছুই জানতাম না। সুতরাং কিছু নিয়েও যাইনি। তিনি অবস্থা বুঝে বললেন, নীচে ঠাকুর ভান্ডার থেকে একটা হরীতকী বা অন্য কোন ফল নিয়ে এস। ঠিক কি ফল এনেছিলাম আমার মনে নেই; তবে সেটি গ্রহণ করে আমাকে নীচে যেতে বললেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন, –"ঠাকুর, এর কল্যাণ কর।" মহাপুরুষ মহারাজের এই আশীর্বাদ তিনি জীবন-ভোর অনুভব করেছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য সংগলাভ বেশী হয়নি সৌম্য চৈতন্যের জীবনে। কারণ, তিনি থাকতেন মঠ থেকে বহুদূরে। তবে গরমের ছুটিতে, দুর্গা পূজায় ও খ্রীস্টমাস ইভেতে ছুটি কাটাতেন মঠে। সে সময় তিনি পবিত্র সংগ করেছেন মহাপুরুষ মহারাজের। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই সৌম্যচৈতন্য গুরুর ব্যক্তিগত সেবা করেছেন প্রাণ ভরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী অখন্ডানন্দজী, স্বামী সুবোধানন্দজী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীকে তিনি দর্শন করেছেন। তবে তাঁদের কাছে কোন প্রশ্ন করে কিছু জেনে নেবার ইচ্ছা তাঁর মনে কখনও উদিত হয়নি। তাঁদেরকে প্রণাম করে চলে আসতেন তিনি। তবে খোকা মহারাজের সংগে ছিল সৌম্য-চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা। খোকা মহারাজ ছিলেন খুব মিশুকে। তিনি সকল সাধু-ব্রহ্মচারীদের সংগে মেলামেশা করতেন কখনও বালকের মত, কখনও বা দাদার মত, আবার কখনও স্নেহশীল পিতার মত। সৌম্যচৈতন্যের একবারও মনে হয়নি যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান; তাঁকে বিশেষ সম্মান করা উচিত। স্বামীজীর ঘরের নীচের বারান্দায় গল্পের আসর বসত। সে আসরে যোগদান করতেন অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসীরা। নানান আলোচনা হত। এখানে অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন সৌম্যচৈতন্য, জেনেছিলেন মঠের পুরাতন কথা, স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী। একবার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত খোকা মহারাজ গেছেন উদ্বোধনে। গম্ভীরানন্দজী সেখানে উপস্থিত। খোকা মহারাজকে নিয়ে যেতে হবে দোতলায়। গম্ভীরানন্দজী একাই কোলে করে তাঁকে নিয়ে গেলেন উপরে। তখন খোকা মহারাজ গম্ভীরানন্দজীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন খুব করে।

স্বামী অখণ্ডানন্দজী একবার তাঁকে অছি পরিষদের সভায় থাকতে বললেন। শুনে তিনি গেলেন ঘাবড়ে। ঐ অছি পরিষদের সভার সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁকে আদেশ করলেন সোনার গাঁতে (বাংলাদেশ) বক্তৃতা দিতে। গম্ভীরানন্দজী বললেনঃ "আমি কখনও বক্তৃতা করিনি।" অখণ্ডানন্দজীর উত্তরঃ "না, তোমাকে যেতেই হবে, তোমাকে বক্তৃতা করতেই হবে।" তবে গম্ভীরানন্দজীর সংগে গিয়েছিলেন একজন বয়স্ক সাধু। সোনার গাঁতে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন মাত্র ৫/১০ মিনিটি। ঐটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বক্তৃতা। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে গম্ভীরানন্দজী গিয়েছিলেন এলাহাবাদ কুম্ভে। গম্ভীরানন্দজী সহ কয়েকজন সাধু মুঠিগঞ্জ আশ্রমে এলেন বিজ্ঞান মহারাজকে দর্শন করতে। বিজ্ঞানানন্দজী উপর হতে বললেনঃ "কে তোমরা?" তাঁরা উত্তর দিলেন নীচ হতেঃ "আমরা রামকৃষ্ণ মঠের সাধু।" উপর হতে আবার প্রশ্ন এলঃ "কোথা হতে আসছ?" নীচের উত্তরঃ "মেলাভূমি হতে।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "বেশ, তাহলে ওখানেই ফিরে যাও।" তিনি দু' একদিন পরে ত্রিবেণী সংগমে মেলাভূমিতে এলেন। তখন তাঁর সংগে হেঁটে মেলা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল গম্ভীরানন্দজীর। বেলুড় মঠে বিজ্ঞান মহারাজ এলে তিনি তাঁর পুণ্যসংগ লাভ করতেন। একবার এক ভদ্রলোক বিজ্ঞান মহারাজের কাছে প্রচুর পরিমাণে ফল, দই, মিষ্টি প্রভৃতি পাঠিয়েছিলেন। গম্ভীরানন্দজী মনে মনে ভাবলেন যে আজকে প্রসাদটা ভালই হবে। কিন্তু হায়, বিজ্ঞান মহারাজ সেগুলি নিক্ষেপ করলেন গংগা গর্ভে। তবে জানা গেল, ঐ ভদ্রলোক ছিলেন অসচ্চরিত্র প্রকৃতির। এ দৃশ্য চিরদিনের জন্য গেঁথে গিয়েছিল গম্ভীরানন্দজীর মনে।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে মহাপুরুষ মহারাজের শুভাগমন হয়েছে বিদ্যাপীঠে। তিনি শ্রীপঞ্চমীর দিন উদ্বোধন করবেন বিদ্যাপীঠের নিজস্ব নবনির্মিত হোস্টেলের দুটি ঘর এবং রান্না ও খাবার ঘর। সৌম্যচৈতন্যের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে রান্নাঘরের। বেশী ফুরসৎ পান না মহাপুরুষজীর কাছে যেতে। বিদ্যাপীঠের মাঠের রাস্তার ধারে একটি উঁচু জায়গা থেকে দেখা যেত বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরের চূড়া। যাত্রীরা ওখান থেকেই প্রণাম করতেন, রাত্রিবাসও করতেন কেউ কেউ। সেখানে বকশিসের আশায় ঢাকীরা বাজাত ঢাক। ঐ উঁচু জায়গাটিকে বলা হত 'দশনীয়া টাট'। সৌম্যচৈতন্য রান্নাঘরে কুটনো কুটছেন। দেখলেন 'দর্শনীয়া টাটে' এসেছেন মহাপুরুষ মহারাজ। তাঁকে দেখে ঢাকীরা আহ্লাদে ঢাক বাজাতে ও নাচতে লাগল। খুব খুশী হয়ে মহাপুরুষ মহারাজ তাদেরকে বকশিস দিয়ে রান্নাঘরে এলেন। সৌম্যচৈতন্যের কাছে এসে বললেন, "এখানে দেখছি মহাশক্তির বিকাশ। কালে এখানে খুব বড় কাজ হবে।" এ কথার অর্থ সৌম্যচৈতন্য তখন বুঝতে পারেন নি, পেরেছিলেন পরে। মহাপুরুষ মহারাজের একটি দুর্লভ অনুভূতির সাক্ষী ছিলেন সৌম্যচৈতন্য। তিনি নিজেই লিখেছেন, "দেওঘরে থাকাকালীন একদিন সকালে কাজের অবসরে মহাপুরুষজীর কাছে গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় বসে হাঁফাচ্ছেন এবং জনকয়েক সাধু পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাপুরুষজীর হাঁফানি রোগ ছিল, দেওঘরের

ঠান্ডায় তা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন সারারাত বসেই কাটিয়েছি আর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন "ব্যথাটা যখন খুব বেড়েছিল তখন এটাতে মন একাগ্র করেছিলাম এবং কষ্টবোধ চলে গিয়েছিল।" অমনি উপস্থিত ওঁকারানন্দজী প্রশ্ন করলেন–"ওটা কি মহারাজ? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ তো আত্মা।"

এই বোধ আজীবন অভ্যাস করার চেষ্টা করেছিলেন সৌম্যচৈতন্য। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, কোন কষ্টের কথা, অসুখের করা চট করে বলতেন না কাউকে। জানাতেনও না সেবকদেরকে। ডাক্তার ডাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। যখন একবার (১৯৭৭) তাঁর পা, ভেঙে গিয়েছিল, তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক, সেবককে প্রথমে কিছুতেই বলতে রাজী হননি। সেবা প্রতিষ্ঠানে পাঠান হল। পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরে এলেন মঠে। যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই মুখে। সে সময়ে তাঁর শোবার ঘরে বসেছিল অছি পরিষদের সভা। প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দ তাঁকে পায়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতেই একেবারে এড়িয়ে গেলেন 'ও কিছুনা' বলে। আবার যখন বৃদ্ধ বয়সে তাঁর হার্নিয়া অপারেশন (১৯৮৩) হয়েছে, তখনও কষ্টের কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। কিংবা যখন তাঁর বুকে 'পেস মেকার' বসান হয়েছে (১৯৮৫), তখনও তিনি নির্বিকার। বরং একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করলে গম্ভীরানন্দজী উত্তর দিয়েছিলেনঃ "বুঝতে পারছি যমের বাড়ির দিকে এগুচ্ছি।" একটু থেমে আবার বললেন, "না, যমের বাড়ির দিকে নয়। একমেবাদ্বিতীয়ং। অহং ব্রহ্মাস্মি। যমের বাড়ি যাব কেন? সে যারা যাবে–যাক। আমি যমের বাড়ি যাচ্ছি না।" এরূপ সহনশীলতা তাঁর জীবনকে মহিমামন্ডিত করেছিল। তিতিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গম্ভীরানন্দজীর জীবন।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে সংঘের প্রথম মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন সৌম্যচৈতন্য। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের দর্শনলাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মহাপুরুষ মহারাজ মধুপুরে শেঠ ভিলায় এসেছেন স্বামী সারদানন্দজীর মহাসমাধির পরে। শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন ওখানে। দেওঘর হতে সাইকেল করে ওখানে গিয়েছেন সৌম্যচৈতন্য মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে। ঐগুলি ছিল তাঁর সাধু জীবনের অমূল্য প্রাপ্তি ও ভবিষ্যতের পাথেয়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ সদ্ভাবানন্দ আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মারোগে। সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মাদ্রাজে। তখন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব পান সৌম্যচৈতন্য ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে। একই সংগে তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষকের পদে। বিদ্যাপীঠে তখন সবেরই অভাব-অর্থ, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি। সৌম্যচৈতন্য কখনও অর্থ সংগ্রহে পারদর্শী ছিলেন না। স্বতঃলব্ধদানে তিনি পরিচালনা করতেন বিদ্যাপীঠ। তবুও তাঁরই সময়ে নির্মিত হয় বিদ্যাপীঠের বিদ্যালয় গৃহ ও হোস্টেল 'ব্রহ্মানন্দধাম'। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁকে সব কাজ করতে হত। ছেলেদের ঘুম ভাঙাবার ঘণ্টা বাজানো; তাদের

হাত মুখ ধোবার দেখ-ভাল করা; প্রার্থনায় যোগদান বা পড়াশুনা করছে কিনা দেখা, ক্লাস নেওয়া–এসব কাজ আরম্ভ হত খুব ভোরে। শেষ হত রাত্রি দশটায়। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ হিসাবে এ কাজেরও বিরাম ছিল না। নিজেই বাজার করে ঝুড়ি নিয়ে আসতেন। পোস্ট অফিস হতে সাইকেল করে আনতেন বিদ্যাপীঠের চিঠিপত্র।

অন্য সকল ব্রহ্মচারীদের মত থাকতেন সৌম্যচৈতন্য। অধ্যক্ষ হয়েও কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিতেন না। অন্যান্যদের মত থালাও ধুতেন নিজেই। সকলের সঙ্গে খেলতেন ভলিবল, ফুটবল, ক্যারাম। কোন সময় নষ্ট করতেন না তিনি। পড়াশুনার প্রতি তাঁর ছিল ঝোঁক। সারা জীবন ছিল এ অভ্যাস। যখন তাঁর দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, তখন নিয়ম করে কেউ না কেউ তাঁকে বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করে শোনাত। রহস্য করে সেবকদের বলতেন: "রামকৃষ্ণ লোকে গিয়েও পাঠ শোনাবি।" দেওঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাঁর ছিল স্নেহ-ভালবাসা। কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। কঠোর জীবন যাপন করতেন, যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করেছেন তিনি। প্রয়োজন বোধে কনিষ্ঠতম নবাগত ব্রহ্মচারীর অভিমত শুনতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে বৈদ্যনাথ মন্দিরে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন জপ করে। তাঁর অধ্যক্ষতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যা গৌরীমার শুভ পদার্পণ হয়েছিল দেওঘর বিদ্যাপীঠে।

মহাপুরুষ মহারাজ আছেন কাশী অদ্বৈত আশ্রমে। হঠাৎ একদিন কাশী থেকে তারবার্তা এল দেওঘরে। তাতে জানতে পারলেন–"ব্রহ্মচর্যের পর যাদের তিন বছর হয়ে গেছে তারা সকলে চলে এস, মহাপুরুষজী স্বামীজীর জন্মতিথি দিবসে সন্ন্যাস দিবেন।" তার বার্তা পেয়ে তিনি যেমন অবাক হলেন, তেমনি তাঁর আনন্দ হল গুরুদেব নিজেই যেচে সন্ন্যাস দিচ্ছেন তাঁকে। এরকম সৌভাগ্য সচরাচর ঘটে না। তিনি হলেন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শুভ জন্মতিথিতে সৌম্যচৈতন্যকে সন্ন্যাস দিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। সন্ন্যাসের আচার্য ছিলেন পণ্ডিত প্রবর স্বামী জগদানন্দ। হবু সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসের নিয়মানুযায়ী আত্মশ্রাদ্ধ করেছিলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। সন্ন্যাসের পর তাঁরা গঙ্গায় দন্ড বিসর্জন দিলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। তাঁর সন্ন্যাস সতীর্থদের মধ্যে এখনও জীবিত আছেন স্বামী শিবস্বরূপানন্দ। "সন্ন্যাসের পর গঙ্গাস্নান করে এবং অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করে আমরা মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। সন্ন্যাসের পরে ভিক্ষা করতে হয়। প্রথম ভিক্ষা দিলেন মহাপুরুষজী নিজেই একটি টাকা দিয়ে এবং বললেন–জিলিপি কিনে খেও। আমরা অদ্বৈত আশ্রমের খোলা মাঠে বসে তাই করেছিলাম"–পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন। দুপুরে ভিক্ষা নিয়েছিলেন অন্যত্র। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সৌম্যচৈতন্যকে নবজন্ম দিয়ে নতুন নাম দিলেন গম্ভীরানন্দ। এতদিনে তাঁর জীবন হল সার্থক, স্বপ্ন হল সফল। সত্যি, তিনি বাইরে ছিলেন গম্ভীর। 'গম্ভীর মহারাজ' নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। সদা সর্বদা গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন–গম্ভীর আত্মা তিনি। বাইরে এত গম্ভীর যে তাঁর কাছে যাওয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু

অন্তরে ছিল রসের ফল্গুধারা। যাঁরাই অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁর সঙ্গে, এ পরিচয় পেয়েছেন একমাত্র তাঁরাই।

যখই মঠবাস করার সুযোয় পেয়েছেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন গম্ভীরানন্দজী। মঠবাসের স্মৃতিচিত্র তিনি বলতেন আমাদের কাছে : 'বেলুড় মঠ বাসে আমরা খুবই উপকৃত হতাম। কেননা, প্রতি সকালে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন ও সান্নিধ্যলাভ করতাম। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম প্রেরণা ও আদর্শ। তখনকার দিনে পরিস্রুত পাণীয় জল ছিল না। গঙ্গার অপর পারে বরাহনগর হতে নৌকা করে আনা হত পানীয় জল। রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য আমরা ব্রহ্মচারীরা বালতি করে গঙ্গার জল তুলতাম একাদশীর দিন (তখন জল পরিষ্কার থাকত)। ময়লা থিতিয়ে গেলে ফটকিরি দিয়ে জল পরিস্রুত করা হত। ঐ জল ব্যবহার হত রান্না ও অন্যান্য কাজে। আমরা চার-পাঁচজন লাইন করে দাঁড়াতাম। গঙ্গার জল শৌচালয়ে ও অন্য জলাধারে ভরে দিতাম। অপর সাধুরাও ব্যবহার করতেন ঐ জল। প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল হল ঘরে আমরা আট-দশজন একসঙ্গে ঘুমাতাম। সে সময় কোন বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। কেরোসিনের হ্যারিকেন ছিল একমাত্র ভরসা। তেল ভর্তি হ্যারিকেন চালাতে হত সাত সপ্তাহের জন্য। খাওয়া-দাওয়া ভাল ছিল না। খুব সাধারণ ডাল-ভাত-নিরামীষ তরকারি।' ব্রহ্মচারী অবস্থায় কোন এক সময়ে তিনি মঠেতে স্বামীজীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন কিছুকাল।

গম্ভীরানন্দজী প্রায় দেড় বছরের (১৯২৯-৩১) মত থেকেছেন উদ্বোধন কার্যালয়ে ও কাশী অদ্বৈত আশ্রমে। স্থির হয়েছে তিনি হবেন উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মী। সে সময় সেখানে একটা বড় রকমের পরিবর্তন হচ্ছিল।

যাবার আগে মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে গেলেন গম্ভীরানন্দজী। নিবেদন করলেন সব। শুনে মহাপুরুষ মহারাজ গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তবে উদ্বোধনে বেশীদিন থাকতে হয়নি তাঁকে। এরপরেই কাশী অদ্বৈত আশ্রমে কর্মী ছিলেন। ওখানে তপস্যার ভাবে ছিলেন। ধ্যান-জপ-পাঠ নিয়ে থাকতেন। অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন নির্ভরানন্দ (চন্দ্র মহারাজ)। গম্ভীরানন্দজীর কাজ ছিল বাজার করা। চন্দ্র মহারাজ প্রতিদিন ছয় আনা দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজাদির জন্য বরাদ্দ ছিল দু আনা। বাকী চার আনা ছিল সাধু সেবার জন্য সব্জি প্রভৃতি ক্রয় করা। মাঝে মাঝে দু' এক পয়সা ফেরতও আনতেন। সর্বদা তিনি ভাল জিনিসপত্র আনতেন বাজার থেকে, যাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার কোন বিঘ্ন না ঘটে, সাধু সেবার কোন ত্রুটি না হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও সাধু সেবার প্রতি এমনই ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা যে তিনি নবীন সন্ন্যাসী হয়েও প্রাচীন সাধুর বাক্য অমান্য করতে পিছপা হতেন না। কাশীতে থাকাকালীন তিনি পন্ডিতের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন।

গম্ভীরানন্দজী প্রায় দশ বছর (১৯৩৬-৪১ ও ১৯৪৫-৪৭) মঠ-মিশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ফলে তাঁকে থাকতে হয়েছিল মঠে। তখনকার দিনে ওয়ার্কিং কমিটির

সদস্যরা নির্বাচিত হতেন ত্রি-বর্ষীয় সাধু সম্মেলনে। প্রথমবারে তিনি ছিলেন মঠের প্রধান কার্যালয়ে 'অফিস মাস্টার' রূপে। অফিস ছিল লেগেট হাউসের মাঝখানের ঘরটিতে। সে সময়ে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ছিলেন 'কেশিয়ার'। তিনি বলেন, "গম্ভীরানন্দজী আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। তবে মিশুকে ছিলেন না। কাঠ-খোট্টা মানুষ তিনি। তবে ভিজিটরস রুমে সাধু-ব্রহ্মচারীদের বির্তক সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। কোন সাধু অন্য কোন কেন্দ্রে কর্মী হলে, তাঁদের জন্য বিদায় সম্ভাষণ লিখে দিতেন।' দ্বিতীয়বার মঠে থাকার সময় তিনি 'শাখা কেন্দ্র সমূহের পরিদর্শক' (Inspector of Branch Centres) নিযুক্ত হন ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে। এই কাজ ছিল বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে পরিদর্শন করে মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেওয়া।

নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। আশ্রম হতে প্রকাশিত হয় সংঘের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'। সম্পাদকীয় অফিস ওখানেই। গম্ভীরানন্দজী তিন বছর (১৯৪২-৪৪) ছিলেন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক। মায়াবতীর অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী পবিত্রানন্দ। নানা বিষয়ে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে লেখা গম্ভীরানন্দজীর সুচিন্তিত সম্পাদয়কীগুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁরই সম্পাদনা কালে খ্যাতিমান শিল্পি আচার্য নন্দলাল বসুর দুটি বিখ্যাত চিত্র–'শিবের বিষপান' ও 'নটরাজ' প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়। তাঁর এক সহযোগী ব্রহ্মচারী (বর্তমানে প্রবীণ সন্ন্যাসী) টাইপ করে দিতেন গম্ভীরানন্দজীর প্রবন্ধগুলি। এগুলি দিয়ে বলে দিতেন: 'দেখ, কেমন হয়েছে।' ব্রহ্মচারী দেখলেন প্রবন্ধগুলিতে ব্যাকরণগত ও বানান ভুল আছে। তাঁকে বলতে ইতস্ততঃ করেছিলেন ব্রহ্মচারী। অবশেষে বলেই ফেললেন তাঁকে। তিনি শুনে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না। বরং বললেন: 'আরে, যা ভাল মনে হবে সব ঠিক করে নেবে।' ব্রহ্মচারী অবাক হয়ে ভাবলেন: 'আমি মাত্র এক বছরের ব্রহ্মচারী। উনি অত বড় মানুষ–সম্পাদক। প্রকৃত সাধু না হলে কেউ এভাবে বলতে পারেন না।'

মায়াবতীর ব্রহ্মচারী বলেছিলেন: 'ওনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি।' শুধু ইনি নন, যে কেন্দ্রে তিনি থেকেছেন, সেখানকার সাধু কর্মীরা সবাই ঐ কথাই বলেন। প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক হবার অনেক পরে আবার মায়াবতীর দশ বছর (১৯৫৩-৬৩) অধ্যক্ষ ছিলেন গম্ভীরানন্দজী।

তাঁর অধ্যক্ষতা কালে মায়াবতীর আশ্রমের উন্নতি হয়েছিল নানান দিকে। সব্জি বাগানের চাষ বাড়িয়েছিলেন, দূর করেছিলেন বহুদিনের জলের সমস্যা, গোশালাতে ভাল জাতের গরু এনে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন, প্রবর্তিত হয়েছিল মধু চাষ। কলকাতাতে ভাল ফুলগাছ আনিয়েছিলেন ফুলবাগানের জন্য। তদানীন্তন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সি. বি. গুপ্তা এসেছিলেন মায়াবতী আশ্রমে। তাঁকে দিয়ে লোহাঘাট হতে আশ্রম পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার মেটাল রোড তৈরী করিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন মায়াবতী রোড। আশ্রমের সাধু নিবাস দোতলা হওয়ায় কর্মীদের থাকার সুরাহা হল।

কলকাতায় প্রকাশনা বিভাগটি ছিল ৪ নম্বর ওয়েলিংটন লেনে। কাজের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছিল, কিন্তু স্থানের সংকুলান হচ্ছিল না। খুব অসুবিধা হচ্ছিল কাজের। তিনি ইন্টালি এলাকায় ৫ নম্বর ডেহি এন্টালি রোডে জমি ক্রয় করলেন ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে। ভিত্তি প্রস্তর দেওয়া হল ঐ বছরের ১৭ই নভেম্বর। তিন বছরের মধ্যে নির্মাণ কার্য শেষ হল বাড়ির। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর প্রকাশনা বিভাগের নতুন বাড়ির উদ্বোধন হয়। সংযোজিত হয়েছে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, বাড়ি তৈরী করাটা গম্ভীরানন্দজীর ছিল হবির মতো। দেওঘরে থাকতে তিনি অনেক ইঞ্জিনীয়ারিং বই পড়েছিলেন।

মায়াবতীতে কর্মীদের সকল কাজে উৎসাহ দিতেন। হাসি-ঠাট্টা করতেন তাঁদের সংগে। দুপুরে খাবার পর সাধুরা লুডু খেলতেন। গম্ভীরানন্দজী খাওয়ার পর এসে লুডুর গুটিগুলো উলট-পালট করে দিতেন সকলের অজান্তে। তারপর সরে পড়তেন তিনি। সাধুরা তাঁর ছেলেমানুষী দেখে মজা পেতেন। আনন্দবাজারের 'অরণ্যদেব' ফিচারটি ছিল তাঁর প্রিয়।

মায়াবতীতেও গম্ভীরানন্দজী নিজের কাজ নিজেই করতেন। তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম নিতে কর্মীরা কখনও দেখেননি। ঐ সময়ে লিখতেন। খাওয়ার পিড়িতে আসতে তাঁর কখনও এক মিনিট দেরী হত না। তাঁর সময়ানুবর্তিতা অপূর্ব–ঘড়ি মেলান যেত। এই সময়ানুবর্তিতা ছিল মহা সমাধির পূর্ব পর্যন্ত। দুপুরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ক্লাস নিতেন। ঘরের বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন–'জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে'। তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত মায়াবতী আশ্রমেঃ 'ঐতিহ্য যেন না নষ্ট হয়, যে কোন প্রকারে হোক তা যেন রক্ষা করা হয়।'

ইতিমধ্যে গম্ভীরানন্দজী নির্বাচিত হয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সভার সদস্য ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। ঐ বছরে এপ্রিলে মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক হিসাবে মঠের প্রধান কার্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। আবার সহকারী সম্পাদক হন ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর। তার আগে তাঁকে 'এডভাইসরী ফিনান্স কমিটি'র সদস্যরূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে।

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সংঘাধ্যক্ষ হওয়ায় গম্ভীরানন্দজী সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত হলেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী। প্রায় তের বছর সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সংগে। তাঁর মধ্যে যেমন ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতা, তেমনি ছিল প্রগাঢ় সাধুতা–এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। সাধারণ সম্পাদক রূপে তাঁর মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি যে কোন বিষয়ে যথোচিত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন। কোন কাজ ফেলে রাখতেন না। যতদূর সম্ভব তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন নিরপেক্ষভাবে। অত্যন্ত গুছালো ছিল তাঁর কাজ। নির্দিষ্ট সময় ধরে চলতেন। প্রয়োজন বোধে সহকর্মীদের মতামত শুনতেন তিনি। যখন কোন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হত, সেগুলির সমাধান করতেন

অতি কৌশলে। দরকার হলে সাধু কর্মীদের ধমকও দিতেন। ব্যবহার করতেন কড়া ভাষা। তাঁর বহু বছরের সহকর্মী বর্তমানে অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দকে তিনি বলেছিলেন: 'ধমক দিতে হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মিষ্টি করে আমি বোঝাতে পারব না। সেক্ষেত্রে তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।' স্বামী ভূতেশানন্দ আরও বলেন: 'স্বামী গম্ভীরানন্দজী ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকটিকেল। ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখর। তাঁর চরিত্রের মহত্তম গুণ ন্যায়পরায়ণতা।' গম্ভীরানন্দজীর অপর এক সহকর্মী বলেন: 'তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠা। সাধন-ভজন ও কর্মে একান্ত একনিষ্ঠ নিষ্ঠা। তিনি যে খুব শুকনো, রসকষহীন ছিলেন, তা নয়। তাঁর মধ্যে দেখেছি খুব হিউমার, উইট্‌স ও মজা।'

দৈনন্দিন কর্মকে ঈশ্বর আরাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন গম্ভীরানন্দজী। ব্যাসদেব রচিত 'শিবমানসপূজনস্তোত্রম'-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। প্রায়ই তিনি আস্তে আস্তে আবৃত্তি করতেন:

"আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো
যদ্‌যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্‌।।"

প্রশাসনের কাজে গম্ভীরানন্দজীকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত সর্বদা। তাঁকে প্রায়ই যেতে হত ভারতের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে পরিদর্শনের জন্য। প্রতি বছরই কয়েকবার করে তিনি যেতেন। তবুও এরই মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে লেখা-পড়ার কাজ করতেন। এ-অভ্যাস ছিল প্রথমাবধি থেকে। এ-ভাবে বহুমূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে সংঘের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। গম্ভীরানন্দজী ছিলেন মনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক চিন্তা-যুক্ত সন্ন্যাসী। শাস্ত্রে ছিল অগাধ পান্ডিত্য। স্বামী জগদানন্দের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন বেদান্ত শাস্ত্র। কাশীতে ও অন্যান্য কেন্দ্রে থাকাকালীন পন্ডিতের কাছে পড়েছিলেন সংস্কৃত ব্যকরণ্‌ ও অন্য শাস্ত্রাদি। আবার নিজেও নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রাদি পাঠ করেছেন। পরবর্তিকালে তিনি বলতেন, 'সাধুরা নিজেরা শাস্ত্র পড়ে ধ্যান করবে। তবেই বুঝতে পারবে শাস্ত্রের মমার্থ।'

স্কটিশ চার্চ কলেজের হোস্টেলের দেওয়াল পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখে প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্যের আঙিনায়। সাধু হিসেবে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন দেওঘর বিদ্যাপীঠের হাতের লেখা পত্রিকাতে। প্রবন্ধের বিষয় স্বামীজী। ও সময় মহাপুরুষ মহারাজ গিয়েছিলেন (১৯২৬) ওখানে। প্রবন্ধটি পড়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। গম্ভীরানন্দজীর মনে হয়েছিল 'খুশী হওয়া'টি ছিল গুরুর আশীর্বাদ। সংঘের বাংলা মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন', ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী'তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজী বিষয়ক স্মারক গ্রন্থগুলিতে।

গম্ভীরানন্দজীর প্রথম বই 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'। প্রকাশনকাল বাংলা ১৩৪৬ সালের আশ্বিন। বিভিন্ন স্তোত্রের সংকলন। তাঁর প্রথম বই সম্বন্ধে মজা করে বলতেন, 'আমার বই তাহলে বাজারে চলবে'। তাঁর সংকলিত, অনূদিত ও রচিত পুস্তকের সংখ্যা চৌদ্দ। সেগুলির প্রথম প্রকাশকাল সহ নামঃ বাংলাঃ স্তবকুসুমাঞ্জলি (১৩৪৬); উপনিষৎ গ্রন্থাবলীঃ ১ম খন্ড (১৩৪৮), ২য় খন্ড (১৩৫০), ৩য় খন্ড (১৩৫১); শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা-১ম ও ২য় খন্ড (১৩৫৯); শ্রীমা সারদাদেবী (১৩৬০); সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ (১৩৬৫); যুগনায়ক বিবেকানন্দ-১ম হতে ৩য় খন্ড(১৩৭৩); কঃ পন্থা (১৯৮৬); এবং ইংরেজীঃ Holy Mother Sri Sarada Devi (1955); History of Ramakrishana Math and Ramakrishana Mission (1957); Eight Upanishads; Vol.I (1957) & Vol.II (1958), with Shankar's Commentary; Brahma Sutra Bhashya of Sri Shankar (1965); The Apostles of Sri Ramakrishana (1966); Chandogya Upanishad with Shankar's Commentary (1983); The Bhagavadgita with Shankar's Commentary (1984)।

ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃক প্রকাশিত 'কালচারেল হেরিটেজ'-এর তৃতীয় খন্ড (পুরোটিতে আছে নানান 'দর্শনে'র প্রবন্ধ), এবং স্বামীজীর ইংরেজীর রচনাবলীর আটটি খন্ড সম্পাদনা করেছেন গম্ভীরানন্দজী। রচনাবলীর প্রতি খন্ড-শেষে গ্রন্থসূচীর সংযোজনা তাঁরই পরিকল্পনা। তাঁর শেষ অনূদিত ইংরেজী গ্রন্থ গীতার মধুসূদন সরস্বতীর টীকা। অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সংশোধনের কাজ এগিয়েছিল দ্বিতীয় অধ্যায় অব্দি। কাজ অসমাপ্ত।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীমায়ের জীবনী। শ্রীমায়ের শতবার্ষিকী পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রামাণিক জীবনী পুস্তক ছিল না। বহুঘটনা ছিল অপ্রকাশিত। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়ের শতবার্ষিকীতে মঠ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই বই রচনার কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। একজন পন্ডিত সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার বহু কাজ। এর মধ্যে আপনার মত আর কেউ এত বই রচনা করেনি। কিন্তু আপনার শ্রীমায়ের জীবনী সবচেয়ে মূল্যবান, বিস্তারিত, সুখপাঠ্য ও প্রামাণিক। শ্রীমায়ের শতবার্ষিকীতে আপনি এই জীবনী লিখে শ্রীমাকে প্রচার করেছেন।' উত্তরে তিনি বলেন: 'এই কাজ করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি, তৃপ্তি পেয়েছি।' বহু পাঠক এই বই পড়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন: 'আপনি কি শ্রীমাকে দর্শন করেছেন?' শ্রীমাকে দর্শন ব্যতিরেকে এই বই রচনা করা অসম্ভব–এ ধারণা ছিল বহুজনের। গম্ভীরানন্দজী এর উত্তরে বলেছেন: 'আমি মাকে চর্মচক্ষে দেখিনি; তাঁকে স্থূল শরীরে দর্শন করিনি। কিন্তু ধ্যান করলে শ্রীমায়ের ছবি ভেসে উঠে। তিনি আমার সংগে সর্বদা আছেন।' এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ তাঁরই করা।

তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বই হল স্বামীজীর জীবনী। স্বামীজীর একটি বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী পুস্তকের অভাব খুবই অনুভূত হচ্ছিল। বিভিন্ন তথ্য বহু বইতে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। বহু নতুন নতুন ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছিল নানান পুস্তকে ও পত্র-পত্রিকায়। আবার বহুঘটনা ছিল অজানা। আরো অনেক ঘটনা প্রাচীন সাধুরা জানতেন। সেগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে প্রামাণিক জীবনী রচনা করা তাঁর মত মণীষী সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তখন তিনি আবার সংঘের সহকারী সম্পাদক ও পরে সাধারণ সম্পাদক পদের মত দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি রচনা করেছিলেন তিন খণ্ডে প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ 'যুগনায়ক বিবেকান্দ'। সহকারী সম্পাদক থাকাকালে অনূদিত হয়েছিল ব্রহ্মসূত্রের শাংকর ভাষ্য। এই অনুবাদ গ্রন্থটি পন্ডিত মহলে ও বিদগ্ধজনের জনের দ্বারা প্রশংসিত ও সমাদৃত। তাঁর ব্রহ্মসূত্র শাংকর ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

শাস্ত্রে ছিল গম্ভীরানন্দজীর অগাধ পান্ডিত্য। তিনি সংঘের পন্ডিত সাধু হিসাবে পরিচিত। বিশেষ করে আচার্য শংকরের গ্রন্থাবলীর উপর তাঁর ছিল অপূর্ব অধিকার, জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি। তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেত কথোপকথনে,প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়। একটি ঘটনা। গম্ভীরানন্দজী গেছেন মহীশূর আশ্রমে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। উপলক্ষ্য-সেখানে উদ্বোধন হবে 'ইনস্টিটিউট অব মোরেল এ্যান্ড স্পিরিচুয়াল এডুকেশন'। এসেছেন আচার্য রামানুজ-দর্শনের পন্ডিত স্বামী আদিদেবানন্দ। এক বিকেলবেলায় গম্ভীরানন্দজী বেড়াচ্ছেন। স্বামী আদিদেবানন্দও সেখানে আছেন। গম্ভীরানন্দজী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, 'আচ্ছা, আচার্য শংকরের ইষ্ট কে ছিলেন?' স্বামীআদিদেবানন্দ বিভিন্ন শাস্ত্র, ভাষ্য ও স্তোত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন আচার্য শংকরের ইষ্ট ছিলেন বিষ্ণু। গম্ভীরানন্দজীও ছাড়বার পাত্র নন। তিনিও নানান ভাষ্য ও স্তোত্র হতে উদ্ধৃতি সহযোগে ঐটি ভুল প্রমাণিত করতে চাইলেন। এই দুই পন্ডিত সাধুর বাদানুবাদ চলছিল প্রায় এক ঘন্টাকালব্যাপী। পুরো দৃশ্যটির সাক্ষী ছিলেন ও তাঁদের বিতর্ক শুনছিলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী। তিনি অবাক হয়ে গেলেন তাঁদের শাস্ত্রের অধিকার ও পান্ডিত্য দেখে। শেষে তরুণ সন্ন্যাসী গম্ভীরানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হল।' উত্তরে বললেন, 'কোন স্থির সিদ্ধান্ত হল না।'

গম্ভীরানন্দজীর চিন্তাধারা প্রবাহিত হত দর্শনের স্রোতে। বিশেষ করে স্বামীজীর 'সেবাযোগ'কে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন সময়ে নানান প্রবন্ধাবলী ও বক্তৃতার মাধ্যমে। এইটি ছিল তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার নতুন অবদান, নতুন সংযোজন। একদিন তিনি এক সন্ন্যাসীর সংগে নানান প্রসংগের মধ্যে 'সেবাযোগ' সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে বলেন, '১৯৬৮-তে ব্যাংগালোরে সেবার আদর্শ সম্বন্ধে আপনা একটি সুদীর্ঘ ভাষণ শুনি। লক্ষ্য করেছি, সে-সময় থেকে আপনি ধীরে ধীরে 'সেবাযোগ' তত্ত্বটি গড়ে তুলেছেন। মঠ-মিশনের চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে এটি আপনার

একটি মূল্যবান সংযোজন। প্রসন্ন হয়ে গম্ভীরানন্দজী বললেন, 'দেখ, লীলাপ্রসঙ্গের ইঙ্গিত ধরেই আমি অগ্রসর হয়েছি। স্বামীজীর সেবার আদর্শকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম চারটিকেই সমন্বিত করে অগ্রসর হতে হবে। স্বামীজীও আমাদের বলেছেন, ঠাকুরের উপদেশের ভিত্তিতে নতুন সাধন প্রণালী উদ্ভাবনের কথা। সেবাযোগকে এদিক থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

গম্ভীরানন্দজী বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করেছিলেন সোনারগাঁতে। স্বাভাবিকভাবে বক্তৃতার প্রতি তাঁর ছিল ভীতি। তিনি তখন মায়াবতীতে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক। সেখানে ১০।১৫ জনের ঘরোয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে উৎসবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বক্তৃতার নামে তিনি সংকুচিত বোধ করতেন। কিন্তু যখন বলতেন তখন অতিসুন্দরভাবে গুছিয়ে একটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন। পরবর্তিকালে ইংরাজী ও বাংলাতে তিনি ছিলেন সুচিন্তিত বক্তা। বক্তৃতাগুলি হত খুবই হৃদয়গ্রাহী। সমাদৃত করতেন গুণিজনেরা। প্রকাশ পেত বাগ্মিতার পরিচয়। একেবারে সার কথাটি তুলে ধরতেন শ্রোতাদের সামনে।

মঠ-মিশনে কয়েকটি নতুন শাখা কেন্দ্র সংযোজিত হয় গম্ভীরানন্দজীর সাধারণ সম্পাদক থাকা কালে : অরুণাচলের আলং, তিরাপ, ইটানগর, আসামের গৌহাটি, অন্ধ্রের হায়দ্রাবাদ ও মধ্যপ্রদেশের রায়পুর। অসুস্থ বৃদ্ধ সাধুদের মঠে থাকবার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। তিনি উদ্যোগী হয়ে বেলুড়ে 'আরোগ্য ভবন' তৈরী করেন। মঠে বৃদ্ধ সাধুদের ভরণ-পোষণ, রোগের সুচিকিৎসা ইত্যাদির জন্য অর্থের কোন বিশেষ তহবিল ছিল না। এ জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা গঠন করেন সাধু সেবার তহবিলটি। মঠে নতুন ব্রহ্মচারীদের থাকবার অসুবিধা। এখানে যোগদানেচ্ছু নবাগত ব্রহ্মচারীদের পাঠিয়ে দেওয়া হত শাখা কেন্দ্রগুলিতে। তাঁর এক সহকর্মী এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। বেলুড় মঠে আরম্ভ হল নবাগত ব্রহ্মচারীদের শিক্ষণ কেন্দ্র (PPTC)।

পড়াশুনার জন্য ও নানান সময়ে প্রশাসনের কাজের চাপে তাঁর তীর্থদর্শনে যাবার সুযোগ হয়ে উঠেনি। যখন তিনি সাধারণ সম্পাদক, কাজের চাপ প্রচন্ড, বয়সও বাড়ছে, তখন বহু সন্ন্যাসীর অনুরোধে তীর্থ-গমনে সম্মত হন গম্ভীরানন্দজী। এ-ভাবে তিনি দর্শন করেন ৺কেদারনাথ-৺বদরীনাথ (অক্টোবর ১৯৭৩),নেপালে ৺পশুপতিনাথ (মার্চ ১৯৭৬), ৺অমরনাথ (জুলাই ১৯৭৬), ৺কন্যাকুমারী (মার্চ ১৯৭৭) এবং ৺গঙ্গোত্রী (অক্টোবর ১৯৭৭)। ৺অমরনাথে তাঁর একটি দর্শনের কথা উল্লেখ করার মত। তিনি ৺অমরনাথ দর্শন করেন ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই। সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক সহকর্মী। ৺অমরনাথে পূজা-দর্শন-স্পর্শন করে নীচে নেমে এসেছেন তাঁরা। কপালে ধারণ করলেন ৺অমরনাথের ভস্ম। ৺অমরনাথ দর্শনের প্রসঙ্গ উঠতেই গম্ভীরানন্দজী বলে উঠলেন : 'দেখ, দেখ, আমি কি দেখলুম জান! আমি দেখলুম ঠাকুর সেখানে বসে আছেন।' জিজ্ঞাসিত হয়ে একথা বহুবার অনেককেই

তিনি বলেছেন, যা সাধারণতঃ তিনি কখনও বলতেন না। কিংবা জিজ্ঞাসা করলে এড়িয়ে যেতেন।

নিরাভিমানিতা গম্ভীরানন্দজীর জীবনে একটি মহৎগুণ। তাঁর রচিত পুস্তকের জন্য কেউ অভিনন্দন জানালে বা তাঁর বক্তৃতা-প্রবন্ধের প্রশংসা করলে নির্বিকার ভাবে চুপ করে থাকতেন তিনি। এ প্রসংগে কোন কথাই বলতেন না বা অভিনন্দনের চিঠির উত্তরে উল্লেখ করতেন না কোন কিছু। যখন তিনি সংঘাধ্যক্ষ, তখনও সেই একই ভাব। প্রায়ই তিনি বলতেনঃ 'প্রেসিডেন্ট বলতে আমাকেই বোঝাচ্ছে, আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি।' দীক্ষার কাজকে বলতেন 'দায়িত্ব বোধ' পালন করা। আর একটি কথা প্রায়শঃই বলতে শোনা যেতঃ 'এই বিরাট পৃথিবী, তার মধ্যে এশিয়া মহাদেশ, তারমধ্যে আবার ভারত, পশ্চিমবংগ হাওড়া জেলা, বেলুড় মঠ। মানচিত্রে একটি ছোট্ট বিন্দুর মত। সেই বিন্দুর মধ্যে গম্ভীরানন্দ।' অর্থাৎ তিনি অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র। নিরহংকার ভাবটি তাঁর মধ্যে ছিল সদাজাগ্রত।

গম্ভীরানন্দজী ছিলেন সংঘের ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। ঐতিহ্য যাতে কোন প্রকারে বিঘ্নিত না হয়, সে-দিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক। একবার মঠে এসেছেন সহাধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী। প্রধান কার্যালয়ের বাইরের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসে আছেন তিনি। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন গম্ভীরানন্দজী। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী। ওঁকারানন্দজী ডাকলেন তাঁকে। আদর করে নিজের পাশেই বেঞ্চিতে বসালেন তরুণ সন্ন্যাসীটিকে। তা দেখতে পেয়েই গম্ভীরানন্দজী অত্যন্ত উদ্বেগের সংগে বলে উঠলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করেঃ 'কি করেছ! স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ এখন আমাদের সংঘের সহাধ্যক্ষ। ওঁর সংগে একাসনে বসা আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী।' তৎক্ষণাৎ তরুণ সন্ন্যাসী আসন ত্যাগ করে লজ্জাবনত মস্তকে উঠে দাঁড়ালেন। ঘটনাটি অতিক্ষুদ্র, কিন্তু সংঘের তাঁর ঐতিহ্য প্রীতির পরিচয়।

ছোটবেলা থেকে গম্ভীরানন্দজীর দৃষ্টি শক্তি কম। স্কুলজীবন থেকেই তিনি রাত্রিতে পড়াশুনা একদম করতেন না। বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। আমেরিকার বোষ্টনে তাঁর বাম চক্ষু অপারেশনের (Retinal detachment) ব্যবস্থা করা হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই অস্ত্রোপচারে সাময়িক ভাবে তিনি উপকৃত হলেও স্থায়ী উন্নতি হয়নি কখনও। বোষ্টনে যাবার পথে ঐ বছরে আগষ্ট-নভেম্বরে আমেরিকার ও ইউরোপের মিশনের সব কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। তার পূর্বে প্রশাসনিক কাজে তিনি গিয়েছিলেন বার্মা, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, শ্রীলংকা (১৯৬৯) এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে (১৯৭২ ও ১৯৭৭)।

বয়সের ভারে, বিশেষতঃ তাঁর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য সাধারণ সম্পাদকের পদে আর থাকতে চাইছিলেন না গম্ভীরানন্দজী। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নারাজ হলেও তিনি নিজের

অক্ষমতা প্রকাশ করলেন বারবার। আপাততঃ তাঁরা তিনমাস তাঁকে ছুটি দিলেন (১৯৭৭) বিশ্রামের জন্য। অবশেষে কতৃর্পক্ষ তাঁকে সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। সহাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন ঐ বছরের ১লা এপ্রিল থেকে। প্রায় ছয় বছর ঐ পদে ছিলেন। এই সময় তিনি অধিকাংশ সময়ে রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে থাকতেন। মাঝে মাঝে মঠে আসতেন।

সহাধ্যক্ষ হবার পর তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। নিজের অসুবিধা-কষ্ট সত্ত্বেও অকাতরে কৃপা বিতরণ করেছিলেন। সবকিছু উপেক্ষা করে মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে, এমনকি বহু প্রাইভেট সেণ্টারে তাঁর শুভাগমন হয়েছে। তিনি চাইতেন না যে তাঁর জন্য অন্যে অসুবিধা ভোগ করুক। রাঁচি আশ্রমে ভক্তেরা তাঁর কাছে আসতেন। পাছে তাঁরা বাজে কথায় সময় নষ্ট করে ফেলে, তিনি আরম্ভ করতে বললেন সৎগ্রন্থ পাঠ করার। কোন একজন ভক্ত পাঠ করতেন তাঁর সামনে। আর সকলে শুনতেন।

সহাধ্যক্ষ থাকাকালে তাঁর বামচোখে ছানি (Cataract) অপারেশন করা হয় (১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে) মদ্রাজে। এই সময়ে গীতা ও ছান্দোগ্য উপনিষদের শাংকর ভাষ্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেন তিনি। এর মধ্যে তিনি মরিশাসে গিয়েছিলেন (১৯৮১) সেখানকার মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর মূর্তি স্থাপনের জন্য।

রাঁচি থেকে গম্ভীরানন্দজী এসেছেন বেলুড়মঠে। তাঁর চৌদ্দ-পনের বছরের এক শিষ্যা প্রায়ই তাঁকে দর্শন করতে আসে মঠে। মেয়েটির মা অপরের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। মেয়েটি থাকে অন্য একজনের বাড়িতে। বর্হিমুখী মন তার। একদিন মঠে এসেছে তার অভিভাবিকার সংগে। সে পূজনীয় মহারাজকে বলছে যে গংগায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। শুনে চমকে উঠলেন তিনি। জোর দিয়ে বললেন : 'কি বল্‌লি ? গংগায় আত্মহত্যা করবি। এভাবে আত্মহত্যা করলে তুই পেত্নী হবি। তোর অভিভাবিকা যা বলছে, তা শুনে চল। এতে তোর ভাল হবে।' মেয়েটি তাঁর গুরুর কড়া ধমকে নিজের ভুল বুঝতে পারল। তাঁর গুরুর কথা পালন করে নিশ্চিত অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছিল মেয়েটি। আর এক ভক্ত দম্পতির মধ্যে চলছিল খুব মনোমালিন্য। অবস্থা এতদূর হয়েছিল যে বধূটি উদ্যত হয়েছিল অত্মহত্যা করতে। কি হল তার মনে, একদিন সে তার গুরুদেবের কাছে সব জানাল। শুনে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বললেন : 'নিজের থেকে কোন সিদ্ধান্ত করো না। শ ষ স-সহ্য কর।' পূজনীয় মহারাজের কথায় বধূটির ভুল ভাংগল। তাঁর গুরুদেবের অমোঘ কৃপায় সে বাঁচল মৃত্যুর হাত থেকে। এখন সে সংসারে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। এরূপ আরোও কতজনকে তিনি সঠিক পথে চালিত করেছেন–কে জানে!

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর চণ্ডীগড় আশ্রম বক্তৃতা দিয়েছিলেন গম্ভীরানন্দজী। বিষয় 'Sadhana according to Sri Ramakrishna'। বক্তৃতার পর তাঁকে জনৈক সেবক জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনার নিজের সাধনা কি ছিল ?' উত্তরে তিনি বললেন :

'অনাসক্তি' যেমন গীতাতে আছে–"জ্ঞেয়ঃ সে নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে"। এইটি আমার সাধনপদ্ধতি।' সেবকের আরোও প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীরানন্দজী বলেছিলেন: 'আমি রোজ নয় থেকে দশ হাজার জপ করতাম। কিন্তু ঐ সঙ্গে অভ্যাস করতাম অনাসক্তি। তবে কখনও কখনও করতাম শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাচিন্তন।' তিনি আরও বলেছিলেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা হলেন এই শ্লোকের মূর্ত প্রতীক। আজকাল আমি দেখি শ্রীরামকৃষ্ণকে হৃদয়-মাঝে–স্বর্গীয় দ্যুতিতে বসে আছেন। না চাইতে কখনও কখনও আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন শ্রীমা।'

হার্নিয়া অপারেশনের (১৯৮৩) পর গম্ভীরানন্দজী বিশ্রাম নিচ্ছেন মঠের আরোগ্য ভবনে। তাঁকে পড়ে শোনান হচ্ছিল মেরী লুই বার্কের নিউ ডিসকভারিজের পাণ্ডুলিপি। পাঠের পর চুপ করে বসে আছেন। হঠাৎ গেয়ে উঠলেন: 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' মাঝে মাঝে তাঁর অনাসক্তির ভাব তীব্র হয়ে উঠত। মধ্যে মধ্যে আপন মনে গাইতেন গান। যদিও কোনদিন সংগীত চর্চা করেননি। তবুও উচ্চাঙ্গ সংগীত–ঠুংরী, খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অগাধ। একদিন এক সন্ন্যাসীকে হাত দিয়ে তাল দেখাচ্ছিলেন। আর বোঝাচ্ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের মর্মকথা। ভালবাসতেন অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের গান। 'পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি হৃদয় দেউল মাঝে'–এই গানটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। একবার তবলাও শিখতে চিয়েছিলেন। দেওঘরে থাকতে দরজা বন্ধ করে একমাস শেখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারবেন না বলে ছেড়ে দিলেন তবলা শেখা।

বিলাসিতা গম্ভীরানন্দজীর জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখতেন না তিনি। এ অভ্যাস ছিল প্রথমাবধি। একবার তিনি আসেন মঠের লেগেট হাউসে। কেউ তাঁকে দিয়েছে একটি ধুতি। এটি তাঁর কোন দরকার ছিল না। পাশে থাকতেন এক নবাগত ব্রহ্মচারী। তাকে দিয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর দুজোড়া জুতা থাকত। একবার তাঁর অতিপরিচিত ভক্ত একজোড়া সুন্দর চপ্পল তাঁকে উপহার দিতে চাইলেন। তাঁর কাছে বারংবার প্রার্থনা জানালেন ভক্তটি যাতে তিনি গ্রহণ করেন। কিছুতেই নিতে চাইলেন না। একান্ত আবদার করাতে ভক্তটিকে রেখে যেতে বললেন। কিন্তু ব্যবহার করলেন না কোনদিনও। আর এক শিষ্য তাঁকে ধরলেন খাবার জিনিস নেওয়ার জন্য। তিনি মোটেই রাজী হলেন না। শিষ্যের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বললেন: 'একটা আম দিও'। তাঁর জনৈক শিষ্যদম্পতি একবার পূজনীয় মহারাজকে অন্তরের ইচ্ছা জানালেন: 'মহারাজ, আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে, আমাকে কৃপা করে জানাবেন।' উত্তরে তিনি বললেন: 'আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।' অপরিগ্রহের দীপটি তাঁর হৃদয়ে সর্বদা অনির্বাণ ছিল। এক কথায়, তাঁর সুদীর্ঘ ৬৫ বছরের জীবনের মূল সুর ছিল–'plain living and high thinking.'

তাঁর খাওয়া-দাওয়া ছিল খুব সাধারণ। আশৈশব পেটের অসুখ তাঁর চিরসংগী। তেল-ঝাল-মশলা হীন তরকারি অম্লান বদনে খেতেন–একেবারে স্বাদহীন। সেবক মাঝে মাঝে রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন: 'বেশ হয়েছে।' খাওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মার্চের সকালে গম্ভীরানন্দজী অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ায় সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। ধরাপড়ে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা। ২৩শে মার্চ তাঁর বুকে বসান হয় 'পেস মেকার'। তখন প্রয়াত হয়েছেন দশম সংঘগুরু। এরপরে তিনি একাদশ সংঘগুরু পদে বৃত হন ঐ বছরে ৯ই এপ্রিল। তখনই বলেছিলেন তিনি: 'বড় জোর চার বছর থাকব।'

সংঘাধ্যক্ষরূপে গম্ভীরানন্দজী প্রথম মন্ত্র দীক্ষা দেন মঠের পুরাতন ঠাকুর ঘরে। সেদিন ছিল ২৯শে মে (১৯৮৫) দশহরা।

বিভিন্ন ঘটনাতে তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তিনি দেওঘরে। চিঠি লিখেছেন মঠে স্বামী কাশীশ্বরানন্দকে একটি রুদ্রাক্ষের জপের মালার জন্য। কাশীশ্বরানন্দ মালা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গম্ভীরানন্দজীকে। অধ্যক্ষ হবার পর তিনি একবার গেছেন কামারপুকুরে। সেখানে অবসর জীবন-যাপন করছেন কাশীশ্বরানন্দ। তাঁর সংগে দেখা হতেই গম্ভীরানন্দজী বলে উঠলেন: 'আপনি আমাকে মালা কিনে পাঠিয়ে ছিলেন। সেটা এখনও আছে।' মঠে একবার তাঁর কাছে এক ডাক্তার-ব্রহ্মচারী এক জোড়া জুতা চেয়েছিলেন। তখন তাঁর কাছে ছিল না। প্রায় ছ'মাস পরে রাঁচিতে এক ভক্ত একজোড়া জুতা তাঁকে দিলেন। ঐ ডাক্তার-ব্রহ্মচারীর আবেদনের কথা মনে করে নিলেন জুতা জোড়াটি। সেবককে বললেন: 'মঠে নিয়ে যাবি। এটি ডাক্তার-ব্রহ্মচারীর জন্য।' মঠে এসে যখন তাকে দেওয়া হলো সে অবাক হয়ে ভাবল: 'মহারাজ ছ'মাস ধরে আমার প্রার্থনাটি মনে রেখেছেন!' গম্ভীরানন্দজী জামশেদপুরে। জুবিলি পার্কে বেড়াতে গেছেন। সংগে আছেন ওখানকার অধ্যক্ষ প্রচীন সন্ন্যাসী স্বামী আদিনাথানন্দ। তিনি বলে দিলেন: 'বেশী হাঁটবেন না। মাত্র দশ মিনিট।' ঠিক দশ মিনিট হাঁটবার পর গম্ভীরানন্দজী সেবককে বলছেন: 'চল ফিরে যাই। কালীদা বুড়ো মানুষ। বলেছেন–শুনতে হয়।' এই বলে আর গেলেন না, ফিরে এলেন।

গম্ভীরানন্দজীর ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি। যা একবার শুনতেন বা পড়তেন, তা মনের মধ্যে গেঁথে রাখতেন–কি গ্রন্থ পাঠে, কি প্রশাসনিক কাজে। যখনই কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হত, বলে দিতেন নির্ভুলভাবে। বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী বলেছেন: 'ওঁর মত স্মৃতিধর সাধু কম দেখেছি।' এই সেদিনকার ঘটনা। প্রতিসন্ধ্যায় মঠ প্রাংগনে বেড়ান সেবকদের সংগে। একদিন প্রসংগ উঠেছে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের কথা। জনৈক সেবক সে-সময় ব্রহ্মসূত্র পড়ত। পূজনীয় মহারাজ: 'কি পড়ছিস আজ।' সেবক–'প্রথম অধ্যায়ের 'আনন্দময়োৎভ্যাসাৎ'

প্রকরণ সূত্র।' বলেই সেবক শোনাতে লাগলেন শাঙ্কর ভাষ্যের বাংলা অনুবাদ। শুনেই বললেন: 'ওটি শঙ্করের মত নয়। বার্তিকারের মত।' সেবক জোর দিয়ে –'না মহারাজ, পরিষ্কার ভাষ্যে লিখা আছে–এটি শঙ্করের মত।' মহারাজ–'না, ওটি বার্তিকারের মত।' দিন দুই পরে সেবক ভাষ্য পড়ার সময় দেখল যে পূজনীয় মহারাজের কথাই ঠিক। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে অন্য বেদান্তীদের মত তুলে দিয়ে আলোচনা করতেন। পরে খন্ডন করতেন। সেবক তাই মনে করেছিল ওটি ভাষ্যকারের মত। সেবক অবাক হয়ে গেল পূজনীয় মহারাজের স্মৃতির কথা মনে করে। সেবক জানত যে পূজনীয় মহারাজ সাধারণ সম্পাদক হবার পর থেকে আর কোন ভাষ্যাদি পড়েননি। প্রায় চব্বিশ বছর হতে চলল। কিন্তু ঠিক তাঁর স্মৃতিতে ধরা আছে। আরো অবাক হল যখন তিনি বললেন যেখানে 'opponent' (ইংরাজীতে অনূদিত তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য পুস্তক) আছে সেখানে 'Prima facie' করতে। পূজনীয় মহারাজ তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে 'বেদান্তী'র ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন 'opponent'। এই শব্দের পরিবর্তে 'Prima facie' শব্দটি হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়। পন্ডিত ডঃ টি, এম, পি, মহাদেবন পূজনীয় মহারাজের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা লিখে দেবার সময় একটি চিঠিতে ঐ উপযুক্ত শব্দটি ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছিলেন। এও প্রায় ষোল বছর আগের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম মহাসম্মেলনে গম্ভীরানন্দজী ছিলেন দর্শকের ভূমিকায়। সংঘের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনে (১৯৮০) তিনি ছিলেন বক্তা। দুটি সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। সুচিন্তিত ভাষণে মুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। মহাসম্মলনে প্রথমদিনের বৈকালিক অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি। বিষয় 'রামকৃষ্ণ-ভাব আন্দোলন'।সভাপতির ভাষণে তিনি মন্তব্য করে শেষে বললেন, "Thus the Ramakrishna Movement is expanding by its inner strength and pointing out to the world the real path of human progress. The world is athirst for such a message and its ultimate success can never be doubted; for the Upanishad says, satyameva jayate nanritam". ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের প্রথম যুব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর অধ্যক্ষতাকালে। তিনিই ছিলেন এর উদ্বোধক। স্বামীজীর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করার আহ্বান জানিয়ে তরুণদেরকে বলেছিলেন, "স্বামীজী নিরূপিত আদর্শ হল: আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'– নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণসাধন। শেষ কথাটি–'জগদ্ধিতায় চ'– শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর আলোকে বোঝা প্রয়োজন। তোমরা জানো, তিনি একদিন দয়ার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে বলেছিলেন, "তুমি দয়া করবার কে? এক ইশ্বরই দয়া করতে পারে মাত্র।" এই ভাব আমাদের কর্মযোগ সম্বন্ধে ধারণার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এটি সমাজসেবা মাত্র নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক সাধনা– নিরহঙ্কার হয়ে ঈশ্বরার্পণের ন্যায় অপরের হিতসাধনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবকে

আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন,–দ্বৈতভূমি থেকে অদ্বৈত ভূমিতে উঠিয়ে দিলেন। উপকারক বা উপকৃত থেকে ঈশ্বর ভিন্ন নন; কাজেই ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করার প্রশ্ন উঠে না। পক্ষান্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাধর্মের কথা যা বলেছেন তার ভাবকর্মই ঈশ্বরোপসনা। এই কর্মের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া অন্য কোন স্বার্থ সাধিত হয় না। ..... তোমরা তরুণ। খোলা মন তোমাদের। তোমরাই পারবে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রচারিত উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে।"

সেবকদের প্রতি গম্ভীরানন্দজীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। যাতে তাঁরা নিয়মিত পড়াশুনার সময় পায়, জপ-ধ্যানের সময় পায়–সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। খোঁজ নিতেন। সেবকরাও তাঁকে নিয়মিত বই পাঠ করে শোনাতেন। এমনও হয়েছে–সেবক পড়া ছেড়ে তাঁকে চা দিতে এসেছে। জানতে পেরে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন: 'তোর নির্দিষ্ট পড়ার সময় শেষ হলে আমাকে চা দিবি। তাতে আমার চা-পান করতে দেরী হয় হোক।' বিশেষ বিশেষ দিনে সেবকদের পাঠিয়ে দিতেন গঙ্গাস্নান করার জন্য। বলতেন: 'এখনই এ-সব না করলে বুড়ো বয়সে করতে পারবি না।' আবার খোঁজ রাখতেন সেবকরা গঙ্গা স্নান করেছে কিনা। তাদের অসাক্ষাতে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন: 'ওরা আমার শরীরের সেবা করে বটে, আমি করি ওদের মনের সেবা।' সেবকদের সঙ্গে বেশ হাসি-ঠাট্টা বা রসিকতাও করতেন তিনি।

গ্রামীন উন্নয়নে ও রিলিফের কাজে গম্ভীরানন্দজীর উৎসাহ ছিল খুব। সংঘের কাজ যাতে বিস্তৃতিলাভ করে, সে-কথা বারবার বলতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি গেছেন সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ত্রাণ শিবিরে, গ্রামে। আরামবাগের (হুগলী) কাছে গৌরহাটি গ্রামের আশ্রমের প্রতি তাঁর একটা স্নেহ ছিল। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ওখানে নির্মিত হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও মর্মর মূর্তি, আরম্ভ হয়েছে গ্রামউন্নয়নের কাজ। গম্ভীরানন্দজীর অধ্যক্ষতাকালে মঠ-মিশনের কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে ১০ টি: আগরতলা ও বারাসাত (১৯৮৫); মেদিনীপুর ও আঁটপুর (১৯৮৬); মাদুরা, পালাই ও লক্ষ্ণৌ (১৯৮৭); শিকড়া, জয়পুর ও কানাডা (১৯৮৮)। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্মভিটাস্থ কেন্দ্রগুলি হল যথাক্রমে বারাসত, আঁটপুর ও শিকড়া। মেদিনীপুর ও লক্ষ্ণৌতে মঠ কেন্দ্র নতুন করে খোলা হল। পালাই কেন্দ্র ত্রিচুর কেন্দ্র হতে পৃথক করা হল। তিনি সংঘাধক্ষ্য ছিলেন চার বছরের কিছু কম। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহু মন্দির, গ্রন্থাগার প্রভৃতির হয় উদ্বোধন করেছেন, নাহয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। নিম্নের তালিকা হতে দেখতে পাওয়া যাবে যে সংঘের কাজে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছেন, নিজের অসুবিধা-কষ্টের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেননি। এমন কি শেষ সময় পর্যন্তও।

তালিকাটি নিম্নরূপঃ ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দ উদ্বোধন করেছেন: গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের নতুন ভবন (শিলং); সাধু নিবাস, রান্নাঘর ও খাবার ঘর, গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ, অফিসঘর,

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় (রাজমহেন্দ্রী); প্রার্থনাগৃহ (জামশেদপুর-সাকচী); শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (নরেন্দ্রপুর)। ভিত্তিপ্রস্তর: শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (সরিষা ও বিশাখাপতনম্); সাধুনিবাস (বিশাখাপতনম্); প্রশাসন ভবন (রাঁচি স্যানেটোরিয়াম)। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ: উদ্বোধন: প্রশাসন ভবন (রাঁচি স্যানেটোরিয়াম); কৃষি ও স্বামীজী জীবনী বিষয়ক যাদুঘর, গ্রন্থাগারের নতুন ভবন (রাঁচি মোরাবাদি); উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন (নরোত্তমনগর); বৃদ্ধা আবাসের নতুন ভবন (বারাণসী); শ্রী রামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি (কাঁথি); শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির (গোরহাটি ও গোয়ালিয়র)। ভিত্তিপ্রস্তরঃ দাতব্য চিকিৎসালয় ও গ্রন্থাগারের নতুন ভবন (বারাসত); শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (চন্ডীগড়)। ১৯৮৭ঃ ভিত্তিপ্রস্তরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (উলসুর-ব্যাংগালোর); প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবন (বেলুড়মঠ)। ১৯৮৮ঃ উদ্বোধনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (রাজমহেন্দ্রী, চিংগলপট্ট ও গৌহাটি); প্রার্থনাগৃহ ও সভামন্ডপ (পুনা); পুনর্নির্মিত শ্রীমায়ের ঘর (কোয়ালপাড়া); কর্মীভবন (কামারপুকুর); বৃদ্ধাবাস (বড়িষা); রান্নাঘর ও গ্রন্থাগার (মাদ্রাজ স্টুডেন্ট হোম); পুনর্নির্মিত নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ি-পুরাতন মঠ (বেলুড়মঠ); রান্না ও খাবার ঘর (কাঁকুড়গাছি); কম্পিউটার সেকশান (অদ্বৈত আশ্রম ও বেলুড়মঠ); সাধুনিবাস (নিউদিল্লী)। ভিত্তিপ্রস্তরঃ রান্না ও খাবার ঘর (মেদনীপুর); শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (কিষেণপুর)।

ঠিক এক বছর আগে সেবক ঘরে গিয়ে দেখেন গম্ভীরানন্দজী প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। এই ঘটনা মঠে। সেবককে দেখে বললেন: 'দেখলি, কেমন প্রস্তুত হয়ে বসে আছি আমি। যম এলেও এরকম প্রস্তুত আছি।' ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনে এক সেবককে বলেছিলেন তিনি: 'এক বছর আর সেবা করবি। তারপর ওখানে (শ্মশানঘাটে) নিয়ে যাবি।' এ ছিল মহাপ্রস্থানের ইংগিত! কিন্তু কেউ বুঝতে পারেননি তখন। সংঘাধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি কোন প্রশাসনিক কাজে লিপ্ত হতে চাইতেন না। তবে কেউ কোন কাজের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হলে শুনতেন ও মতামত দিতেন। সংঘাধ্যক্ষ হবার এক বছর পরে তিনি বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। জিজ্ঞাসু ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, যা আগে তিনি করেননি। কোন এক যুবক পূজণীয় মহারাজের কাছে দেখা করতে এসেছে। আগে হতে সময় নির্দিষ্ট ছিল। সেবককে বাইরে যেতে বললেন। যুবক ঘরের ভিতর। সেবক হঠাৎ শুনতে পেল পূজণীয় মহারাজ জোরে জোরে যুবককে কি যেন বলছেন। সেবক কিছু বুঝতে না পেরে দৌড়ে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখে তিনি দৃঢ়স্বরে যুবকটিকে বলছেন: 'আমি ঠাকুরকে দেখেছি। তুমিও করলে দেখতে পাবে।' যুবকটি পেয়ে গেল তার প্রশ্নের প্রার্থিত উত্তর। আনন্দে তাঁকে প্রণাম করে চলে গেল।

এই সময় হতে গম্ভীরানন্দজীকে দেখা যেত সর্বদা জপ করতে। শুয়ে শুয়ে জপ করছেন করে। বসে জপছেন মালা। সেবকদের দৃষ্টিতে আগে কখনও এরূপ অবস্থা ধরা পড়েনি।

সকল সময় অন্তর্মুখীন ভাব। দুর্গাপূজার পর তিনি উত্তর ভারতের কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে মঠে ফিরলেন ১০ই ডিসেম্বর। পরের দিন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী গেছেন তাঁর কাছে। বললেন: 'আপনি আগের চেয়ে ভাল হাঁটছেন, দেখলুম।' গম্ভীরানন্দজীর উত্তর: 'এমনি ভালই। এই হেঁটে এলুম। না হে, আমি বুঝতে পারছি, আর থাকব না।' কিন্তু তখনও কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি এ-কথা।

গত ১৫ই ডিসেম্বর গিয়েছিলেন বামুনমুড়া, শিকড়া, বারাসত (সবগুলি উঃ ২৪ পরগণাতে) ও নবদ্বীপে। এইটি ছিল তাঁর শেষ যাওয়া। বারাসত হতে নবদ্বীপ যাবার আগে তিনি মন্দিরে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে। সেদিন তিনি প্রণাম করলেন অনেকক্ষণ ধরে। ওখান হতে বেরিয়ে আসার পর আবার তাকালেন শ্রীমন্দিরের দিকে। সেবক সবই লক্ষ্য করছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ আচরণগুলি। এছিল নিজ গুরুর (মহাপুরুষ মহারাজের জন্মস্থান বারাসত) কাছ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ।

বারাসতে থাকতে গম্ভীরানন্দজীর শরীরে তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। সেবককে কিছু বললেন না। এই শরীর নিয়ে নবদ্বীপে এলেন ২০শে ডিসেম্বর। তাপমাত্রার সংগে একটু ফোলা দেখা দিল পায়ে। স্থানীয় ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর ছিল দীক্ষার দিন। মনে আশংকা ছিল দীক্ষার কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে কিনা। দীক্ষার পর গুরু প্রণামের সময় সেবককে পা থেকে মোজা খুলে দিতে বললেন। সেবকের আপত্তিতে তাঁর উত্তর: 'মোজা খুলে দে। ওরা ত বারবার প্রণাম করার সুযোগ পাবে না।' সব শেষে ঘরে এসে বললেন: 'I was afraid whehter I could continue or not, but it went off very will.' ঐ দিনই রাঁচির এক শিষ্যাকে তার ছেলের বিয়ের জন্য আশীবাদ চিঠিতে সই করলেন। ঐটি তাঁর স্বাক্ষরিত শেষ চিঠি।

২৩শে ডিসেম্বর ভোরে উঠে তিনি সেবককে বললেন: 'শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। জপ করতে পারব না। শুয়ে থাকব।' কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে উঠে বসলেন। তখন তিনি অনেকটা ভাল বোধ করছেন। দাড়ি কামাতে কামাতে থাই-এর উপর তাল ঠুকতে ঠুকতে আপন মনে গান ধরলেন: 'একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ,। অতীত-আগামী-কালহীন,। দেশহীন, সর্বহীন, "নেই নেই" বিরাম যথায়।' এদিন ছিল দীক্ষার দিন। সব মংগলমত শেষ হল। সন্ধ্যায় কাসির সংগে একটু রক্ত পড়ল।

২৪শে ডিসেম্বরের সকালে নবদ্বীপ হতে মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। পূর্বমুহূর্তে ভক্তদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন: 'হ্যাঁ, সব বেশ ভালই হল। শরীর খারাপ হয়েছে। তোমাদের দোষ নয়।' আগেই সংবাদ পাঠান হয়েছিল মঠে। মঠে এসে দুপুরের আহারাদি করলেন। বিশ্রামের পর সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে ভর্তি করা হল। ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়, ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সি ও ডাঃ নিরঞ্জন ব্যানার্জী ছিলেন পূজনীয় মহারাজের চিকিৎসক। তাঁকে

একেবারে 'বেড রেস্টে' রাখা হল। শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য দেওয়া হল অক্সিজেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল দুটো ফুসফুসে জমে গেছে কফে।

২৫শে ডিসেম্বরে একই অবস্থা। ঐদিন মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ বার্ষিক সভা। তাঁরই সভাপতি হবার কথা ছিল। তাই তিনি একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়ে দিলেন। সেটি পাঠ করা হল সভাতে। এটাই ছিল তাঁর শেষ শুভেচ্ছা বাণী।

২৬শে ডিসেম্বর গম্ভীরানন্দজীর শরীর ভালর দিকে। আশংকার কোন কারণ নেই। বেডে শুয়ে শুয়ে গান ধরলেন: 'নদীয়ার পথে পথে, কাংগালের বেশে হরি, নাম প্রেম বিলাইলে, ধরাতলে অবতরি।' পুরো গানটি গেয়ে শেষকালে বললেন 'ইতি শ্রীগৌরাংগ।' প্রতিদিনই কেউ না কেউ মঠ থেকে তাঁকে দেখে আসছেন। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন–বিরাট ফাঁকা মাঠ। একা সেখানে বসে আছেন। স্বপ্নের কথা সাধারণতঃ কাউকে বলতেন না। সেদিন কিন্তু বললেন সেবককে।

২৭শে ডিসেম্বর মংগলবার। সেদিন গম্ভীরানন্দজী খুব ভালো–প্রদীপ নির্বাপিত হবার আগে দীপশিখার হঠাৎ উজ্জ্বলতার মত। বেশ হালকা মেজাজে ছিলেন। শরীরে নেই তাপমাত্রা। আহার এক প্রকার। বিকাল ৩-৩০ মিনিটে চাপান করেন তিনি। চা দেওয়া হল ফিডিং কাপে। ঠান্ডা চা খাচ্ছেন। চা খেতে খেতে রসিকতা করছেন: 'একে ঠান্ডা চা। তার মধ্যে আবার ভেজাল।' সেবকের সবিস্ময়: 'ভেজাল!' পূজনীয় মহারাজের উত্তর: 'ওই যে ওষুধ খাওয়ালি।' চায়ের আগে তাঁকে খাওয়ানো হয়েছে এ্যান্টোবায়োটিক। ঠাট্টা করে এটিকে বলছেন 'চায়ে ভেজাল।'

বিকাল ৫-২০ মিনিটে মঠ হতে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী আত্মস্থানন্দ গেছেন দেখা করতে। স্বামী গহনানন্দ আগেই দেখা করে চলে গেছেন অন্যত্র। উনারা পূজনীয় মহারাজের ঘরে। তিনি মঠের খবর জানতে চাইলেন। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ জানালেন: অরুণাচলে বমডিলায় নতুন কেন্দ্র খোলার কথা, ত্রিপুরায় আমতোলি ও ধলেশ্বর কেন্দ্র নেওয়ার কথা, হিংগলগঞ্জ ও গোসাবায় ত্রাণকাজের কথা, এক ব্রহ্মচারী সংঘে পুনরায় যোগদানের সমস্যার কথা। সব মন দিয়ে শুনলেন বললেন: 'বেশ, ভাল ভাল।' উনারা লক্ষ্য করছেন যে পূজনীয় মহারাজের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তাঁরা বললেন: 'মহারাজ, বিশ্রাম করুন। বেশী কথা বলবেন না।' উনারা বিদায় নিয়ে চলে এলেন। এই ছিল তাঁদের শেষ বিদায়। তখনও কেউ ঘুণাক্ষরে অনুমান করতে পারেননি যে কিছুক্ষণ বাদেই তিনি ত্যাগ করবেন ইহধাম।

সন্ধ্যা ৬-০০ মিনিটে জল খেতে চাইলেন তিনি। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পান করলেন জল। ডাক্তার উচ্চচাপ মাপলেন–ঠিক আছে। তবে নাড়ীর গতি বেশী। শরীরে তাপমাত্রা ১০০.৬°। পায়খানার বেগ পেল। তখনও সেবকরা বুঝতে পারেননি কিছুই।

৬-৩০ মিনিট। পূজনীয় মহারাজ কাসলেন। কফে উঠে এল রক্ত। সেবককে বললেন: 'দেখ, শরীরে তাপ বেশ হয়েছে, উচ্চচাপও বাড়ছে। ডাঃ রায়কে একবার খবর দে।' সেবক একটি ক্রোসিন ট্যাবলেট খাওয়ালেন। ডাক্তারদের খবর দেওয়া হল। হাসপাতালের রেজিস্ট্রার (ডাক্তার) এলেন। পূজনীয় মহারাজ খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। জোরে জোরে নিচ্ছেন শ্বাস। শরীর ঘেমে গেছে। ডাক্তারকে বললেন: 'I am feeling uneasiness।' এইটি ছিল তাঁর শেষ বাক্য। সেবকরা লক্ষ্য করলেন–পূজনীয় মহারাজ তিনবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন শেষ প্রণাম জানাচ্ছেন শ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীকে। তারপরেই স্থির হয়ে যায় তাঁর শরীর। সময় সন্ধ্যা ৭-২৭ মিনিট।

মঠে খবর এল। সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দকে গম্ভীরানন্দজীর মহাসমাধির কথা জানান হল। শুনে স্বামী অভয়ানন্দ বলে উঠলেন: 'গম্ভীরানন্দও চলে গেল!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মঠ হতে প্রাচীন সাধুরা ছুটে গেলেন সেবা প্রতিষ্ঠানে। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মহাসমাধির সংবাদ দ্রুত প্রচারিত হল আকাশবাণী ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ফুলে ঢাকা তাঁর মরদেহ মঠে আনা হল। পরের দিন (২৮শে ডিসেম্বর) ভক্তদের শেষ দর্শনের সুযোগের জন্য মরদেহ রাখা হল স্বামীজীর আমগাছের তলায়। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর পার্থিব দেহ চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হল বেলা সওয়া দুটোয়। পঞ্চভূতের দেহ বিলীন হয়ে গেল পঞ্চভূতে। আকাশে তখন হাল্কা মেঘ। সূর্যের রক্তিম আভা মিলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমাকাশে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর ভৌতিক শরীর পূত চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে। সেস্থান সজ্জিত হয়েছে পুষ্পরাজিতে। সান্ত্বনা দিচ্ছে তিনি আর পার্থিব শরীরে নেই। কিন্তু তিনি আমাদের স্মৃতিতে সজীব। তিনি ভক্তদের হৃদয়ে উজ্জ্বল। তিনি ভক্তদের ধ্যানের বস্তু। কিন্তু তাঁর সুন্দর আদর্শ জীবন, অমল-ধবল চরিত্র, আধ্যাত্মিক ভাব সম্পদ আমাদের সকলের কাছে চির প্রেরণাদায়ক। তাই কবি গেয়েছেন– 'তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা কে বলে তুমি নাই, তুমি আছ-মন বলে তাই।

"আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সাধনা চারটি যোগকেই মিশিয়েই চলেছে। তবে কেউ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ হয়ত প্রাধান্য কর্মকে দিচ্ছেন। কেউ ধ্যানকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। সেটা নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী। কিন্তু সকলেরই ভিতরে এই চারটি যোগ একসংগে চলেছে। স্বামীজী তাঁর রাজযোগের গোড়াতে বলেছেন যে, ভগবান্‌লাভ সব পথেই হতে পারে। চারযোগের যে কোনটাকে অবলম্বন করে হতে পারে। তবে আদত কথা হচ্ছে মুক্তিলাভ করা। সেই মুক্তিলাভের জন্য দুটো যোগকে এক-সংগে কর বা তিনটিকে কর বা চারটিকে একসঙ্গে কর। আবার স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন—যে কোনযোগ অবলম্বন কর, জ্ঞানলাভ হয় বটে, মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু যে এই চারটিকে একসংগে সমন্বয় করতে পারেনি তার চরিত্রটা ঠিক রামকৃষ্ণরূপ মুষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয়নি। ভাষাটা একটু কঠিন। অর্থাৎ রামকৃষ্ণরূপ যে ছাঁচ সেই ছাঁচে সেই ঢেলে তার চরিত্রটি গঠন করা হয়নি, যদি চার যোগকে আমরা সমন্বয় করতে না পেরে থাকি। সেই চার যোগের সমন্বয়ের কথা ঠাকুর বলে গেছেন। স্বামীজীও আমাদের বলে গেছেন। আবার তাঁরা সেবা-ব্রতের কথাও শুনিয়ে গেলেন এবং স্বামীজী এই সেবাকেই প্রাধান্য দিলেন। **বস্তুতঃ এই সেবার মধ্যেও যোগ সমুদয়ের সমন্বয় ঘটেছে।** এই কথা লীলা-প্রসংগে আছে।"

স্বামী গম্ভীরানন্দ